জিনজিয়াংয়ের নিপীড়িত উইঘুর জনগোষ্ঠীর ওপর রচিত
মর্মস্পর্শী ঘটনা অবলম্বনে

উইঘুরের মেয়ে

শাহ মুহাম্মাদ খালিদ

প্রকাশনায়
রাহনুমা প্রকাশনী™

উৎসর্গ

আমার বাবা ও মা

আমার দুনিয়া যাদের হাত ধরে
আমার জান্নাত যাদের পদতলে।

'ইয়া রব! আপনি তাদের ওপর রহম করুন
যেভাবে আমায় তারা প্রতিপালন করেছেন
আমার ছেলেবেলায়।'

মুখবন্ধ

আজ বড় আনন্দের দিন। প্রথম বই যেদিন প্রকাশিত হয়, সেই দিনটি যে-কোনো লেখকের জন্যই স্মরণীয় হয়ে থাকে। লেখালেখির সাথে সম্পর্ক সেই কিশোর বয়স থেকে। দেয়ালিকা, স্মারকগ্রন্থ, মাসিক-পাক্ষিক পত্রিকা—সব পেরিয়ে আজ প্রথম নিজের কোনো বইয়ের ভূমিকা লিখতে বসেছি। কয়েকটা কাজ একসাথে শুরু করেছিলাম। একটা শেষ না হতে আরেকটা। ইতোমধ্যে পেরিয়ে গেছে কর্মজীবনের চার চারটি বছর। সব কিছুর পর অপেক্ষার প্রহর আজ শেষ হতে চলেছে।

একটা বিষয় ভেবে বড় আনন্দিত হই, আজ থেকে পনেরো বছর আগেও আমাদের প্রকাশনা-জগৎ অতটা সুসমৃদ্ধ ছিল না। *মোকসুদুল মুমিনীন* থেকে শুরু হয়ে *ঈমানদীপ্ত দাস্তান* পর্যন্তই ছিল ইসলামী প্রকাশনার পরিধি। একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে মূলত বাংলাদেশে ইসলামী প্রকাশনীগুলোর উত্থান শুরু এবং মাত্র দশ বছরের মধ্যে বিশাল এক বিপ্লব সাধিত হয়েছে এই অঙ্গনে। একুশে বইমেলায় বৈষম্য করে ইসলামী প্রকাশনাগুলোকে স্টল বরাদ্দ দেওয়া হয় না, তবু বছর শেষে দেখা যায় বইয়ের বিক্রিতে তারা সাধারণ প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে অনেক বেশি এগিয়ে—এই গল্পও এখন পুরোনো হয়ে গেছে।

আজ যখন চোখ মেলে ডানে বামে তাকাই, বড় আমুদে বোধ হয়। প্রশান্তির একটা ঢেউ বয়ে যায় হৃদয়মনে। আহ! কত চমৎকার সব বই! কী তার বিষয়বৈচিত্র, কী তার লিখনশৈলী! মৌলিক, অনুবাদ, ভ্রমণ, ইতিহাস, গল্প-কবিতা-উপন্যাস, শিশুতোষ, কথাসাহিত্য—সব মিলিয়ে বিশাল এক

ভান্ডার তৈরি হয়ে গেছে। বইয়ের ছাপা, প্রচ্ছদ, বাঁধাই, বানান সচেতনতা নিয়েও সন্তুষ্ট পাঠকমহল।

পিসি ও মোবাইয়ের স্ক্রীনে পিডিএফ চলে আসার পর আমরা আশঙ্কা করেছিলাম, ছাপা-বইয়ের জগৎ সম্ভবত কোণঠাসা হয়ে পড়বে। কিন্তু আদতে তা হয়নি। হৃদয়ের গভীর থেকে বিষয়বস্তু উপলব্ধি করতে এখনো পাঠকের পছন্দ ঝাঁ তকতকে মলাটের মুদ্রিত বই। কফির মগ হাতে নতুন বইয়ের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে লেখকের সাথে তারা হারিয়ে যেতে চান গল্পের গভীরতায়।

লেখক বেড়েছে, প্রকাশনী বেড়েছে, সাথে পাঠকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে অনেক। সব মিলিয়ে আমাদের প্রকাশনা জগৎ বিগত দেড় দশকে অনেকটা পথ এগিয়ে গেছে। এই দেশে বইয়ের জগতে এখনই ইসলামী প্রকাশনাগুলো রাজত্ব করছে। উন্নতির এই ধারাবাহিকতা যদি অব্যাহত থাকে তাহলে সেদিন বেশি দূরে নয় যেদিন দামেশক-বৈরুতের সাথে এই ঢাকার কথাও উচ্চকিত হবে।

বিভিন্ন জায়গা থেকে অনুবাদের প্রস্তাবনা এলেও আমি চেয়েছি প্রথম বইটা মৌলিক হোক। সেক্ষেত্রে বেছে নিয়েছি এমন একটি বিষয় যার জন্য আমাদের হৃদয়ে সর্বদা রক্তক্ষরণ হয়। এমন একটি জাতির উপাখ্যান, একমাত্র মুসলিম হওয়ার অপরাধে যারা আজ মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে। পূর্ব-তুর্কিস্তান (বর্তমান জিনজিয়াং)-এর বন্দিশিবিরগুলোতে অনবরত ধুঁকছে তারা। অব্যাহত দমন-পীড়ন আর জাতিগত বিনাশে উইঘুররা এখন বিলুপ্তির দোরগোড়ায়।

পৃথিবীতে অনেক কিছু নিয়ে কথা বলার লোক আছে। কিন্তু চীনের ভাগ্যাহত মুসলিমদের পক্ষে বলার মতো কেউ নেই। সুসমৃদ্ধ ইতিহাসের অধিকারী একটা জাতি এভাবে তিলে তিলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে, এ নিয়ে খোদ মুসলমানদেরও মাথাব্যথা নেই। খেয়েদেয়ে পরিবার নিয়ে জানে টিকে থাকতে পারাকেই জীবন মনে করা হয়। মাথাব্যথা হবে তখন যখন নিজেরা আক্রান্ত হব। কিন্তু তখন আমাদের নিয়ে ভাববার অন্য কেউ থাকবে না। এভাবে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হতে হতে আজ আমরা ভেড়ার পালে পরিণত হয়েছি।

এই উপাখ্যানে আমি চেয়েছি নিরীহ উইঘুরদের দুর্দশার কথা তুলে ধরতে, যারা একুশ শতকের এই কথিত সভ্যতার যুগেও ইতিহাসের নিকৃষ্টতম নিগ্রহের শিকার। এমন কিছু বিবরণ তুলে ধরতে চেয়েছি, যাতে আমাদের রক্তশীতল যুবকেরা একটু হলেও ভাবে—তাদের মায়ের বয়সি মহিলাদের সাথে জিনজিয়াংয়ের বন্দিশিবিরগুলোতে যে বীভৎসতা চলছে, এখনই সতর্ক না হলে সেটা নিজেদের বেলায় ঘটতে পারে যে-কোনো সময়।

নিজের প্রথম বই প্রকাশের যে আনন্দ, উইঘুর শিশুদের মলিন মুখগুলোর কথা মনে পড়লে মুহূর্তেই তা উবে যায়। আক্ষরিক অর্থেই আনন্দের ব্যাপার হতো যদি আমি একটি জাতির উত্থান ও উৎকর্ষের কাহিনি লিখতে পারতাম। কিন্তু আমাকে লিখতে হয়েছে একটি জাতির পতন ও অধঃপতনের খতিয়ান, জালিমের নির্মমতা থেকে বাঁচতে যারা এখন আজরাইলের পথ চেয়ে বসে আছে।

উইঘুরদের মাতৃভূমি জিনজিয়াংয়ে চীনের প্রচণ্ডরকম কড়াকড়ির কারণে সেখানে কোনো সংবাদমাধ্যমের উপস্থিতি নেই। ফলে সেখানে কী সব ঘটনা ঘটে চলেছে সে ব্যাপারে বিশদ বিবরণ বা তথ্যপ্রমাণ কমই পাওয়া যায়। তারপরও ইঙ্গমার্কিন সহায়তায় তাদের মদদপুষ্ট সংবাদমাধ্যমগুলো উইঘুরদের বিষয়ে মাঝেমধ্যে সংবাদ প্রচার করে। স্যাটেলাইট থেকে নতুন অনেক বন্দিশিবিরের ফুটেজ পাওয়া যায়। বিশেষ করে যারা কোনোভাবে জিনজিয়াংয়ের নরক থেকে পালিয়ে আসতে পেরেছে তাদের সাক্ষাৎকার থেকে মৌলিক তথ্যগুলো পাওয়া যায়।

মূলত চীন থেকে পালিয়ে আসা এমন দুজন নারীর কাহিনিকে উপজীব্য করে আমাদের এই উপাখ্যান। এদের একজন হচ্ছেন বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী মিহিরগুল তুরসুন, অপরজন লন্ডনের বাসিন্দা রেইলা আবু লাইতি। বইয়ের পরিশিষ্টে জিনজিয়াংয়ের মৌলিক একটি বিবরণ এবং মিহিরগুল তুরসুনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় যুক্ত করা হয়েছে।

রাহনুমা আমাদের প্রকাশনা জগতে খুব পরিচিত একটি নাম। মাহমুদ ভাইয়ের কল্যাণে রাহনুমা থেকে অসংখ্য পাঠকনন্দিত বই আমরা উপহার পেয়েছি। এমন একটি প্রতিষ্ঠিত প্রকাশনী থেকে নিজের প্রথম বই প্রকাশিত হচ্ছে এটা বড় আনন্দের ব্যাপার।

বিভিন্ন উৎস থেকে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য বের করে আনতে বেশ কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। সময়ও ব্যয় হয়েছে প্রচুর। যদি পাঠক বইটি পড়ে নির্যাতিত স্বজাতীয় ভাইদের প্রতি একটু সহমর্মী হন এবং এই সংকট সমাধানের উপায় কী হবে সে প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে শুরু করেন তাহলেই আমাদের এই পরিশ্রম স্বার্থক হবে।

শাহ মুহাম্মাদ খালিদ
উত্তরা, ঢাকা।

সূচিপত্র

রেইলা আবু লাইতি—১৫
মিহিরগুল তুরসুন—৭৭
পূর্ব-তুর্কিস্তান
ইতিহাস থেকে বর্তমান—১৮২

রেইলা আবু লাইতি

১

অনেকক্ষণ ধরে একটা বড় স্টিমারের অপেক্ষা। ছোট ছোট বোট আসছে। তবে ছোট বোট দেখতে আমরা আসিনি, যা দেখতে এসেছি তার জন্য লাগবে বড় জাহাজ। শেষতক একটা বড় জাহাজ চলেই এল। উজ্জ্বল হয়ে উঠল আম্মার মুখ। পৃথিবী-বিখ্যাত একটা স্থাপত্যকীর্তির দর্শক হতে যাচ্ছেন তিনি। লন্ডনের টেমস নদীর ওপর শত বছর ধরে দাঁড়িয়ে থাকা এই ব্রিজ বিশ্বময় পরিচিতি পেয়েছে তার বিশেষ নির্মাণশৈলীর কারণে। ব্রিজটা এত নিচু, সামান্য উঁচু কোনো জাহাজ বা স্টিমার এলে ব্রিজের পাটাতনের সাথে তা আটকে যাবে। ফলে এ ধরনের নৌযান অতিক্রমের জন্য নেওয়া হয় ভিন্ন ব্যবস্থা।

আম্মা দেখতে লাগলেন। লাইটপোস্টে লাল বাতি জ্বলে উঠতেই গাড়িগুলো সব থেমে গেল। ব্রিজের উভয় পাশের রাস্তায় একটা অটোমেটিক ব্যারিকেড চলে এল। জাহাজটি আরেকটু কাছাকাছি আসতেই ব্রিজটা ঠিক মাঝখান থেকে দু-ভাগ হয়ে ওপরে উঠে যেতে লাগল। জাহাজ অবলীলায় পার হয়ে গেল। এরপর আবার পাটাতন দুই দিক থেকে নিচে নেমে এলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়ে এল। আম্মা বিমুগ্ধ নয়নে বললেন, রেইলা, জিনজিয়াংয়ে লেভেল

ক্রসিংয়ে ট্রেনের জন্য গাড়ি থামতে দেখেছি। এখানে দেখছি জাহাজের জন্য ব্রিজের গাড়ি থেমে যায়!

আম্মা কৌতূহলী দৃষ্টিতে এক সময়ের বিশ্বমোড়ল ব্রিটেনের রাজধানী লন্ডনের এটা সেটা দেখেন। আর আমি একদৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। মায়াবী এই মুখখানার দেখা পেলাম কতকাল পর! তিনি এখানে এসেছেন এক মাস হলো। আম্মা আসার পর ফেলে আসা অতীতটা স্মৃতিতে সজীব হয়ে ওঠে বারবার। আমার দেশ, আমার জন্মভূমি, আমার পরিবার! জিনজিয়াংয়ের পবিত্র ভূমির সেই সোদা গন্ধ! যেই ভূমির রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে আছে আমার পূর্বসূরিদের রক্ত, ঘাম আর সংগ্রামের কত অজানা ইতিহাস। কাশগড়, উরুমকি আর তারিম বেসিনের পথঘাট ও উদ্যানগুলোর কথা মনে পড়লে আজও বুকটা মোচড় দিয়ে ওঠে। ১৬ লাখ ৬৫ হাজার বর্গকিলোমিটারের এই সুবিশাল ভূখণ্ড ছিল এককালে মধ্য-এশিয়ার অন্যতম সমৃদ্ধ রাষ্ট্র। কোথায় এখন সেই পূর্ব-তুর্কিস্তান?

'রেইলা! চলো ওদিকটা ঘুরে দেখি!'

আম্মার কথায় বাস্তবে ফিরে এলাম। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের দিকে হাঁটতে লাগলাম। আম্মাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে অনেকদিন পর তিনি মুক্ত বাতাসে শ্বাস নিচ্ছেন। জিনজিয়াংয়ের পরিবেশ এখন এমনই। সকালবিকাল ফৌজি ইউনিফর্ম আর নাকমুখ কুঁচকে থাকা চীনা সৈন্যদের দেখতে থাকলে সুস্থ মানুষেরও দম বন্ধ হয়ে আসবে। এক দশক আগে সেই জন্মভূমি ছেড়ে এসেছি, এরপর আর ফেরা হয়নি সেখানে। এরই মধ্যে টেমস নদী দিয়ে কত জল গড়াল! জীবনের রোজনামচায় কাহিনির কত স্তূপ জমা পড়ল! রিজওয়ানের সাথে পরিচয়ের পর জীবনের স্রোতধারাই যেন পালটে গেল। যেদিন প্রথম দেখা হয় তার সাথে সেদিন পরিচয়ের পুরোটা ইচ্ছে করেই তাকে বলিনি। শুরুর কয়েকদিন রিজওয়ান কেবল এতটুকু জানত আমি এক চীনা মেয়ে। কিন্তু কয়েকদিন পর তার সন্দেহ হতে শুরু করল। কারণ, আমার চেহারা আদৌ চীনাদের মতো না।